28-11-2018 **প্রাতঃ মুরলি** **ওম্ শান্তি** **"বাপদাদা"** **মধুবন**

"মিষ্টি বাচ্চারা - মনুষ্যকে দেবতা বানাবার সেবায় খুব আগ্রহ থাকা উচিত তোমাদের । অবশ্য এই সেবার জন্য নিজের মধ্যে গভীর ধারণারও প্রয়োজন"

***প্রশ্নঃ -** আত্মা কালিমালিপ্ত হয় কিভাবে ? আত্মাতে কি জাতীয় ময়লার প্রলেপ পড়ে ?*

***উত্তরঃ -** পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্মরণের যোগ থাকলে আত্মা কালিমালিপ্ত হয়। নম্বর ওয়ান ময়লা দেহ-অভিমানের। এরপর শুরু হয় লোভ ও মোহের। বিকারগুলির ময়লাই আত্মাতে প্রলেপ পড়তে থাকে। এছাড়াও ময়লা জমে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া এবং সেবাকার্য না করার কারণে ।*

🎶🎼 *গীত :- তোমাকেই ডাকতে যে চায় মন-আমার, সৌভাগ্য বানাতে যে ব্যাকুল মন-আমার।*

ওঁম্ শান্তি! বাঃ, খুব সুন্দর গীত। বাচ্চা বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে - বাবার এই বিশেষ জ্ঞান শুনে তা আবার অন্যকেও শোনাবে। কোনও কোনও বাচ্চা ভাবে, বাবাকে স্মরণ করা বাচ্চার অবশ্য কর্তব্য। কারও বা আবার বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে সাথে সাক্ষাৎকারও হয়। তাই তো প্রবাদও আছে, কোটি-কোটির মধ্যে, এখানে এসে কারও কারও ভাগ্যে এই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাবার সৌভাগ্য হবে। জ্ঞানের প্রাপ্তিতে বাচ্চারা এখন বিশাল বুদ্ধির অধিকারী। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও নিশ্চয় বাবা এসে এভাবেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। অন্যদের প্রথমেই তা বোঝাতে হবে, কে শুনিয়েছিলেন এই জ্ঞান। যেহেতু এটাই সবচেয়ে বড় ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা স্বয়ং যে 'গীতা-রত্ন' শোনান তা সর্বশাস্ত্রের মাতা শিরোমনি এবং ভারতবাসীদের একমাত্র শাস্ত্র। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা তা ভুলেই গেছে, সর্ব শাস্ত্রের মাতা এই গীতা-রত্ন পূর্বে কে শুনিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে কোন ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল? লোকেরা একথা অবশ্য বলে- "হে ভগবান তুমি এসো"। ফলে ভগবানও অবশ্যই আসেন-নতুন দুনিয়া অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া রচনার লক্ষ্যে। তিনি তো সমগ্র দুনিয়ারই ফাদার - তাই না? ভক্তরাও তার উদ্দেশ্যে কীর্তন করে - "তুমি এলেই তো -শান্তি আসবে।" 'সুখ' আর 'শান্তি' কিন্তু পৃথক। সত্যযুগে শান্তির সাথে সাথে অবশ্যই সুখ থাকে। সেখানে ছাড়া বাদবাকী আত্মারা তখন শান্তির দেশেই থাকে। যে বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উচিত।

নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, যার নাম রামরাজ্য। সেই রামরাজ্যে সুখ ছিল বলেই তো রামরাজ্যের এত মহিমা। সেই সময়কে রামরাজ্য বলা হলে, বর্তমান সময়কে অবশ্যই রাবণরাজ্য বলতেই হয়। যেহেতু বর্তমান দুনিয়ায় এত দুঃখ-কষ্ট। সেখানে যে সুখ, বাবা এসেই তা সুখকর বানান। এছাড়া অন্যান্যরা সবাই তো শান্তিধামেই শান্তিতে থাকে। যদিও 'শান্তি' আর 'সুখ' উভয়েরই দাতা এই বাবা। বর্তমানের এই দুনিয়াতে কেবলই অশান্তি আর দুঃখ। অতএব বুদ্ধিতে যেন এই জ্ঞানের ধারা সর্বদাই বইতে থাকে। যার জন্য প্রয়োজন তেমন সুন্দর স্থিতির। যদিও ছোট বাচ্চাদেরও তা শেখানো হয়, কিন্তু তারা তো আর তার অর্থ বোঝাতে পারে না। এর জন্য দরকার গভীর ধারণার। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে যাতে সঠিকভাবে তা বোঝাতে পারো। যার জন্য খুব ভাল স্থিতির দরকার। আর তা না হলে, কখনও দেহ-অভিমানে, কখনও ক্রোধে বশীভূত বা মোহের ফাঁদে পড়তে হয়। অনেকে তা লিখেও জানায়-"বাবা আজ আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছি, আজ আমি লোভের বশবর্তী হয়েছি .....!" কিন্তু স্থিতি শক্তিশালী হলে, তখন আর কোনও কিছুতেই পরাভূত হবে না। তখন কেবলই আগ্রহ থাকবে-কিভাবে মনুষ্যকে দেবতা বানাবার সেবা করা যায়। এই গীতও খুব সুন্দর - "বাবা, আমরা সুখী তখনই হবো যখন তুমি আসবে।" তাই বাবাকে যে আসতেই হয়। না এলে পতিত সৃষ্টি পবিত্র হবেই বা কি প্রকারে। কৃষ্ণ হলেন দেহধারী। ওনার এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের নামও আসে না এক্ষেত্রে। লোকেরা যে বলে পতিত-পাবন এসো, তাদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত, কার উদ্দেশ্যে একথা বলছে তারা? পতিত পাবন তবে কে আর উনি আসেনই বা কখন? পতিত পাবনকে যখন ডাকা হয়, তবে নিশ্চয়ই বর্তমানের এই পতিত দুনিয়াতেই তাকে ডাকা হয়।

পবিত্র দুনিয়া বলা হয় সত্যযুগকে। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাবে কে? গীতাতেও আছে প্রতি কল্পেই একমাত্র ভগবানই এই রাজযোগের শিক্ষা দেন বিকারগুলি থেকে বিজয় পাবার জন্য। কাম-বিকারই মহাশত্রু। তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, তোমাদের একথা কে জানাচ্ছেন- "আমি রাজযোগের শিক্ষা দেই, কাম-বিকার মহাশত্রু.....? আর এ কথাই বা কে বলেছেন, আমি সর্বব্যাপী? কোন শাস্ত্রে তা লেখা আছে? আর কাকে উদ্দেশ্য করে পতিত-পাবন বলা হয়? পতিত-পাবন কি গঙ্গা নদী নাকি অন্য কেউ?" গান্ধীজি-ও তো সর্বদাই বলতেন, "পতিত-পাবন তুমি এসো"! গঙ্গা নদী

তো তখনও ছিল, যেমন বহুযুগ ধরে আছে। এসব কোনও নতুন ঘটনা নয়। গঙ্গা তো অবিনাশী, কিন্তু তত্ত্বটাই যে তমোগুণী হয়ে যায়, ফলে তাতেই আসে চঞ্চলতা। যা বন্যার আকার ধারণ করে। নদীও তখন নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে গতিপথের পরিবর্তন করে। কিন্তু সত্যযুগে সবকিছুই থাকে স্বাভাবিক। কম বা অতি বেশী বৃষ্টিও হয় না তখন। যেহেতু সেই সময়কালে দুঃখ বলতে কিছুই থাকার নিয়ম নেই। অতএব বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই ধারণ করা উচিত যে, একমাত্র এই পতিত-পাবন বাবাই আমাদের প্রকৃত বাবা। সেই পতিত-পাবন বাবাকেই লোকেরা যখন স্মরণ করে, তখন বলেও কিন্তু -হে ভগবান, হে বাবা। কিন্তু কথাগুলি আসলে কে বলে? -অবশ্যই তা আত্মাই বলে। তোমরা তো উপলব্ধিও করতে পারো পতিত-পাবন শিববাবা এখন এসেছেন এই দুনিয়াতেই। তবে নিরাকার শব্দটি অবশ্যই বলতে হবে, তা না হলে তো বাবাকে সাকার ভাববে লোকেরা। পতিত তো হয় আত্মা। তাই একথা বলাটা যুক্তিযুক্ত হয় না যে, সর্বভূতেই ঈশ্বর। 'অহম ব্রহ্মাস্মি' কিম্বা 'শিবোহম' বলা একই ব্যাপার। সম্পূর্ণ রচনার মালিক তো এক ও একমাত্র সেই রচয়িতা। যদিও লোকেরা এর লম্বা-চওড়া অনেক রকম অর্থই করবে, কিন্তু আমাদের মূল কথা তো কেবল এক সেকেণ্ডের কথা। এই এক সেকেণ্ডেই তো বাবার থেকে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। বাবার বর্সা অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার পাওয়া। যাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এটাই আবার জীবনবন্ধ। একথাও বোঝাতে হবে, ভবিষ্যতেও তোমরা যখন আসবে, তখনও তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের, মুক্তি-জীবনমুক্তির এই বর্সা পাবে। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে লেখা হয়, মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা কেবল সেই একজনই। এ বিষয়েও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম- 'আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম।' যেখানে দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধ পর্যন্ত্য থাকে না। যেহেতু তা সুখধাম। সূর্য-বংশীরাই রাজত্ব করে সেখানে। পরে ত্রেতায় সেই রাজ্য পায় চন্দ্র-বংশীরা। এরপর দ্বাপরে ইসলামী এবং বৌদ্ধদের রাজত্ব। সবকিছুই পূর্ব নির্দ্ধারিতই হয়ে আছে। ছোট্ট বিন্দুর মতন আত্মাতে আর পরমাত্মাতে কত বিশাল এই পার্ট খোঁদিত আছে। শিবের চিত্রেও তা লিখতে হবে-"আমি জ্যোর্তিলিঙ্গম, কিন্তু বিশালাকার মোটেই নই। আমি তো এক অতি ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ। যেমন আত্মারাও অতি ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ। আর তা বোঝাবার জন্য বলা হয় দুই ভ্রুকুটির মাঝে চকমক করছে এক আশ্চর্য তারা ..... সেটাই আত্মা, আর আমি পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু আমি পরম, পতিত-পাবন তাই আমার গুণগুলিও ভিন্ন!" এরপর গুণগুলিকেও লিখতে হবে। চিত্রের একদিকে শিবের মহিমা, অপরদিকে থাকবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। তখনই সবাই বুঝতে পারবে দুই-এর ভিন্নতা। শব্দ ও অক্ষরগুলি এমন সুন্দর করে লিখতে হবে যাতে লোকেরা তা পড়ে খুব সহজেই বুঝতে পারে। স্বর্গ ও নরক, সুখ আর দুঃখ, তা কৃষ্ণের দিন কিম্বা রাত হোক, অথবা ব্রহ্মার দিন কিম্বা রাত - একই ব্যাপার। সুখ আর দুঃখের এই খেলা কিভাবে চলে, তা তোমরা বি.কে.-রা তো জানোই। সূর্যবংশীরা ১৬ কলায় সম্পূর্ণ সতোপ্রধান আর চন্দ্রবংশীরা ১৪ কলার সতোগুণী। সূর্যবংশীরাই পরবর্তীতে চন্দ্রবংশী হয়। অর্থাৎ সেই সূর্যবংশীরাই ত্রেতাতে চন্দ্রবংশীকুলে জন্ম নেবে। যেহেতু রাজ্যভাগ্য পদ তাদেরই থাকে। এইসব তথ্যগুলি বুদ্ধিতে খুব ভাল করে গেঁথে নিতে হবে। যে যত স্মরণের যোগে থাকবে, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে পারবে, সে তত বেশী ধারণা ধারণ করতে পারবে এবং সেবাকার্যও সে তত বেশী পরিমাণে করতে পারবে। খুব স্পষ্ট করে কারওকে শোনাতে হবে : আমি এমন ভাবে ওঠা-বসা করি, এমন সব ধারণা ধারণ করি, এমন ভাবে অন্যকে বোঝাই, অন্যদের বোঝাবার জন্য এমন রীতিতে এমন সব বিচার সাগর মন্থন করি, সর্বক্ষণই যেন এমনই বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে মনে। আর যে এই জ্ঞানকে ধারণ করে না তার কথা আলাদা, তার তো কোনও ধারণাই হবে না। ধারণার জন্য সেবাকার্যে ব্রতী হওয়া অবশ্যই দরকার। সেবার পরিধিও এখন অনেক বিস্তৃত হচ্ছে দিন-প্রতিদিন। তেমনি সেবার মহিমাও তেমনই বাড়ছে। তেমনি তোমাদের প্রদর্শনীগুলিতেও আরও অনেক বেশী লোকের সমাগম হতে থাকবে। কত নতুন নতুন চিত্রাদিও বানাতে হবে এর জন্য। অনেক বড় বড় মণ্ডপও বানাতে হবে তখন। যদিও এসব বোঝাবার জন্য একটু শান্ত পরিবেশের দরকার। তোমাদের মুখ্য চিত্র হলো কল্প-বৃক্ষের ঝাড়। এছাড়া গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি চক্র এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের। রাধা-কৃষ্ণের চিত্রের দ্বারা সেভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারবে না, এনারা প্রকৃত কে? তোমরা বি.কে.-রা যদিও বা এখন তা সঠিক ভাবেই বুঝেছো যে, বাবা তোমাদের তেমন ভাবেই পবিত্র করে গড়ে তুলছেন। যদিও এতে সবাই তো আর একই রকমের সম্পূর্ণ হবে না। আত্মারা তো পবিত্র হবে। কিন্তু জ্ঞান সবাই একই রকমের ধারণ করতে পারবে না। যার ধারণা যত কম হয়, তা বোঝাও যায় সে কেমন কম পদ পেতে পারে।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি এখন যথেষ্টই তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রত্যেক ক্লাসেই তো ক্রমিক অনুসারে ছাত্রেরা থাকে। কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, কেউ ভোঁতা বুদ্ধির - এতেও আবার ক্রমিক অনুসারে থাকে। কোনও ভাল লোকের ভাগ্যে যদি তাকে বোঝাবার জন্য কোনও থার্ড ক্লাসের বি.কে. পড়ে, তখন সে ভাববে এখানে তো তেমন কিছুই বোঝার নেই। এই কারণেই তো ভাল করে পুরুষার্থ করানো হয়, বিশিষ্ট লোকেদের বোঝাবার জন্য। তেমন কাউকেই যেন না দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য।

সবাই তো আর একই রকমের পাস করে না। বাবারও তো একটা নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা আছে। কল্প-কল্প ধরে এই একই পাঠের রেজাল্টও বের করতে হয় ওনাকে। মুখ্যতঃ সর্বাধিক নম্বরে পাস করে ৮-জন। তারপরে বেশী নম্বরে পাস করে ১০০-জন। এরপর পাস করে ১৬-হাজার। এছাড়া তারাও পাস করে যারা প্রজা পদের অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ ধনী ব্যাবসায়ী, কেউ বা গরীব, সব ধরণেরই থাকে। বি.কে.-দের পুরুষার্থের ধরণ দেখেই বোঝা যায়, কে কোন পদের উপযুক্ত পুরুষার্থ করছে। কে কোন পদের উপযুক্ত হতে পারবে। টিচার তো তা বুঝতে পারবেই। অবশ্য টিচারদের মধ্যেও আবার ক্রমিক অনুসারে আছে। কোনও ভাল টিচার পড়াবার সময় ছাত্ররা সবাই খুব খুশী হয়ে বলে ইনি খুব ভাল পড়ান, কত স্নেহ-মমতাও করেন। এমন টিচারেরাই ছোট সেন্টারকে বড় সেন্টারে রূপান্তরিত করতে পারে। অতএব কত বুদ্ধি সহকারে কাজ হাসিল করতে হয়। জ্ঞান-মার্গে চলতে গেলে খুব মিষ্ট স্বভাবের হতে হয়। কিন্তু মিষ্ট হতে পারবে তখনই, যখন মিষ্টি এই বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হতে পারবে, তখনই সম্পূর্ণ ধারণা হবে। কিন্তু আশ্চর্যের, এমন মিষ্ট বাবার সাথেও অনেকেই যোগযুক্ত হয় না। তারা এটাই বোঝে না যে, গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেও বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হতে হবে অবশ্যই। মায়ার তুফান তো আসবেই। কোনও কোনও পুরোনো মিত্র-সম্বন্ধীকেও মনে পড়বে। কারও আবার অন্য কিছুও স্মরণে আসতে থাকবে। কিন্তু এইসব মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিকে স্মরণ করা মানেই আত্মাকে কালিমালিপ্ত করা। ময়লা হলে যে আবার ভয় পেয়েও যাবে। কিন্তু এতে ভয়ের কিছু নেই। মায়া তো এমনই করাবে। আত্মাতেই ময়লা জমবে। যেমন দোলের সময় কত ময়লা পড়ে। কিন্তু লাগাতার বাবার স্মরণে যোগযুক্ত থাকলে আত্মাতে ময়লা আর জমতেই পারবে না। বাবাকে ভুলে গেলেই সর্বপ্রথম দেহ-অভিমানের ময়লা জমে। তারপর একে একে লোভ, মোহ,.... ইত্যাদি সবই আসতে থাকবে। অতএব নিজের স্বার্থে পরিশ্রম তো করতেই হবে। এই ভাবেই পুণ্যার্জনও করতে হবে, এবং নিজের মতন করে অপরকেও তেমনি বানাবার চেষ্টা করতে হবে।

সেন্টারেও খুব সুন্দর করে সেবার কার্যে মন লাগাতে হবে। এখানে এসে তো (বাবাকে) বলো -"ফিরে গিয়ে নানা ধরণের প্রবন্ধ করবে, সেন্টার খুলবে ....., কিন্তু যেই এখান থেকে গেলে, অমনি সবকিছুই ভুলে গেলে। এখানে আগে ভাট্টীতে থাকতে হয়, যতদিন না অন্যকে বোঝাবার উপযুক্ত হয়ে উঠছো। শিববাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়া অর্থাৎ মিষ্ট থেকেও অতি মিষ্ট যোগের অনুভূতি। তারপরেই নিজে বুঝতে পারবে কি ধরণের সেবার উপযুক্ত হয়েছো তুমি। স্থুল সেবার পুরস্কার তো অবশ্যই পাবে। অনেকেই এমন কষ্টকর পরিশ্রমের সেবা করে। কিন্তু তাতেও তো বিষয়বস্তু থাকবে। ঐ পাঠেতে যেমন জাগতিক পড়াশোনার নানা বিষয় আছে তেমনই এই ঈশ্বরীয় পাঠেতেও নানা বিষয় আছে। যার প্রথম বিষয়টি হলো স্মরণের যোগ, তারপর জ্ঞানের পড়াশোনা। এছাড়া যা কিছু তা সবই গুপ্ত। তাই এই ড্রামাকে বুঝতে হয় আগে। লোকেরা তো এটাই জানে না যে, প্রতিটা যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। কত বছর চলে সত্যযুগ? আচ্ছা তখন সেখানে কোন ধর্মের অবস্থান থাকে? সবচাইতে বেশী বার জন্ম কাদের হয়? বৌদ্ধ, ইসলামি, ইত্যাদিরা কেন এত বেশী জন্ম পায় না? এসব কিন্তু কারও বুদ্ধিতেই নেই। শাস্ত্রকারদের জিজ্ঞেস করা উচিত, কার উদ্দেশে তোমরা বলো 'ভগবানউবাচ'? সর্ব শাস্ত্রের মাতা শিরোমনি তো গীতা। শুরুতে ভারতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। কি শাস্ত্র ছিল তাদের? প্রকৃত গীতার বাণী কে প্রথম শুনিয়েছিলেন? কৃষ্ণ ভগবানউবাচ তো কোনও প্রকারেই হতে পারে না। স্থাপনা আর বিনাশ - তা তো একমাত্র ভগবানের কর্ম-কর্তব্য। সুতরাং কৃষ্ণকে তো আর ভগবান বলা যায় না। এছাড়া এই দুনিয়ায় কৃষ্ণের অবস্থান ঘটে কখন? সেই কৃষ্ণ এখন কি রূপেই বা আছে? অতএব শিববাবার বিপরীতে কৃষ্ণের মহিমা অবশ্যই লিখতে হবে। এই শিবই হলেন প্রকৃত গীতার প্রকৃত ভগবান। ওনার থেকেই তো কৃষ্ণ নিজের পদ পান। তাই তো শ্রীকৃষ্ণেরও ৮৪-জন্ম দেখানো হয়। এরপরেই ব্রহ্মাকে যিনি দত্তক নিচ্ছেন তার চিত্রও দেখাতে হবে। বুদ্ধিতে ৮৪-জন্মের মালা যেন ভালভাবে ঢোকে। অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণেরই ৮৪-জন্মকে বিস্তারে বোঝাতে হবে।

রাতে বিচার সাগর মন্থন করে আরও বিস্তারিত ভাবধারায় তা ভাবতে হবে। জীবনমুক্তি তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। এ বিষয়ে আর কি বা লেখার প্রয়োজন? জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছানো। তা সম্ভব হয় তখনই যখন বাবা অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা স্বয়ং তার সন্তানদের কাছে আসেন। তারা বাবার আপন হতে পারলে তবেই সে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারে। সত্যযুগ পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। আর বর্তমানের এই কলিযুগী দুনিয়া হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সেই দুনিয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া রাবণের রাজত্ব চলে না। যদিও এইসব জ্ঞান আত্মা তে আর থাকে না তখন। কিন্তু এটুকু অবশ্যই স্মরণে থাকে - আমি আত্মা, এখন আমার এই শরীরে বার্দ্ধক্য এসেছে, এই জরাজীর্ণ শরীর এবার ত্যাগ করতে হবে - এসব জ্ঞান স্মরণে অবশ্যই থাকে। কিন্তু এখানে তো এখন আত্মার বিষয়েই কোনও সম্যক জ্ঞান নেই কারও। তাই তো অতি অবশ্যই বাবার থেকে জীবনমুক্তির বর্সা নিতেই হবে। অতএব বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে - তাই না? সেই কারণেই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন- 'মনমনাভব'! প্রকৃত অর্থে গীতাতে কে বলেছেন-

'মনমনাভব', আমাকে আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো - এমন কথা আর কে বা বলতে পারেন? কৃষ্ণকে তো আর পতিত-পাবন বলা যাবে না। এমন কি ৮৪-জন্মের রহস্যও যে কেউ জানে না। এসবই লোকেদেরকে বোঝাতে হবে সঠিক রীতিতে। অতএব, আগে নিজেরা তা ভালভাবে বুঝে নিয়ে নিজের ও জগতের লোকদের কল্যাণ করলে তোমাদেরই মান-সম্মান বাড়বে। সাহসে ভর করে এখানে ওখানে যেতে থাকো। তোমরা হলে গুপ্ত সেবাধারী। প্রয়োজনে বি.কে.-পোষাক পাল্টেও সেবা করো। আর হ্যাঁ, চিত্র যেন সর্বদাই কাছে থাকে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারা নিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মিষ্টি বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হয়ে অতি মিষ্ট স্বভাবের ও দেহী-অভিমানী হতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে প্রথমে নিজে তা ধারণ করে তারপর অন্যকেও তা বোঝাতে হবে।

২) নিজের স্থিতিকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্ভয় হতে হবে। মানুষ্যকে দেবতা বানাবার সেবায় আগ্রহ থাকতে হবে।

বরদানঃ- স্বরাজ্যের সত্বা দ্বারা বিশ্বরাজ্যের সত্বা প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান হও*

বিস্তার :- বর্তমান সময়ে যে স্বরাজ্যের সত্বাধারী অর্থাৎ কর্মন্দ্রিয়জিৎ, সে বিশ্বের রাজ্য সত্বা পেয়ে থাকে। স্বরাজ্য অধিকারী-ই বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হয়। অতএব, আত্মার মন-বুদ্ধি-সংস্কারের শক্তিগুলিকে চেক করো-আত্মা কি প্রকৃতই এই তিনের মালিক হয়ে আছে? মন তোমাকে চালাচ্ছে নাকি তুমি মনকে চালাচ্ছো? এমন তো হচ্ছে না যে কখনও কখনও সংস্কার তার দিকে টেনে নিচ্ছে? স্বরাজ্য অধিকারীর স্থিতিতে সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়া অর্থাৎ যার মধ্যে কোনও প্রকারের শক্তির ঘাটতি থাকে না।

স্লোগানঃ- সর্ব খাজানার চাবী - "মেরা বাবা" সাথে থাকলে আর কোনও আকর্ষণই আকৃষ্ট করতে পারে না।*